কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৬

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ১০

সূরা লুকমান (২০-৩৪ আয়াত)

اَلَمۡ تَرَوۡا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمۡ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ وَ اَسۡبَغَ عَلَیۡكُمۡ نِعَمَهٗ ظَاهِرَۃً وَّ بَاطِنَۃً ؕ وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ یُّجَادِلُ
فِی اللّٰهِ بِغَیۡرِ عِلۡمٍ وَّ لَا هُدًی وَّ لَا كِتٰبٍ مُّنِیۡرٍ

২০. তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ কোন জ্ঞান, কোন পথনির্দেশ বা কোন দীপ্তিমান কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে।

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে সেসব নেয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবনযাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা—এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেয়া, আল্লাহ-রাসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলিমদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা- এসবই প্রকাশ্য নেয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত।

আর গোপনীয় নেয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত- যথা ঈমান, আল্লাহর পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি। অথবা যেসব নেয়ামত মানুষ জানে না এবং অনুভবও করে না সেগুলো গোপন নিয়ামত। মানুষের নিজের শরীরে এবং তার বাইরে দুনিয়ায় তার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে এমন অগণিত ও অসংখ্য জিনিস রয়েছে কিন্তু মানুষ জানেও না যে, তার স্রষ্টা তার হেফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তাকে জীবিকা দান করার জন্য, তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য এবং তার কল্যাণার্থে কত রকমের সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় করে রেখেছেন। [দেখুন: ফাতহুল কাদীর; বাগভী]

وَ اِذَا قِیۡلَ لَهُمُ اتَّبِعُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَیۡهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَ لَوۡ كَانَ الشَّیۡطٰنُ یَدۡعُوۡهُمۡ اِلٰی عَذَابِ السَّعِیۡرِ

২১. আর তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তা অনুসরণ কর। তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে, তবুও কি? (তারা পিতৃ পুরুষদের অনুসরণ করবে?)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি তিনি যে রহমত বা অনুগ্রহ দান করেছেন সে কথাই বর্ণনা করেছেন। প্রকাশ্য অসংখ্য নিয়ামত ছাড়াও অপ্রকাশ্য আরো অসংখ্য নিয়ামত তিনি দান করেছেন। এ সকল জিনিস কেবল মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকাশ্য নেয়ামত ও অনুগ্রহের অর্থ হল, যা জ্ঞান ও

ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আর অপ্রকাশ্যগুলো হল, যা মানুষের অনুভূতির বাইরে। যেমন রাসূলদেরকে প্রেরণ, কিতাব নাযিলকরণ ইত্যাদি। যিনি এতোগুলো নিয়ামত দান করেছেন, তার সত্তার উপর সবারই ঈমান আনয়ন করা একান্তভাবে উচিত ছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এখনো বহু লোক আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতে রয়েছে। এর পিছনে তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কোন দলীল ও যুক্তি-প্রমাণ নেই। মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা নির্লজ্জের মত উত্তর দেয়- আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি তারই অনুসরণ করবো।

এ সম্পর্কে পূর্বে সূরা হাজ্জের ৩ নং আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা কাফির-মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতার কথা বর্ণনা করে বলেছেন, তাদেরকে যদি বলা হয় আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর তখন তারা বলে যেন না, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করব। যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ নির্বোধ ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন: "আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর; তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষগণকে পেয়েছি; যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিল না এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্তও ছিল না। তবুও কি (তারা তাদের অনুসরণ করবে)।" (সূরা বাকারাহ ২:১৭০)

কোন প্রকার দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে একজনের অনুসরণ করাটা বোকামী ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না। তাদের অবস্থা এমন যেন, তারা যুদ্ধ করবে অথচ তাদের হাতে কোনই তরবারি নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়া থেকে হেফাযত করুন।

وَ مَنۡ يُّسۡلِمۡ وَجۡهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَ هُوَ مُحۡسِنٌ فَقَدِ اسۡتَمۡسَكَ بِالۡعُرۡوَةِ الۡوُثۡقٰى ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ عَاقِبَۃُ الۡاُمُوۡرِ

২২. আর যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, এমতাবস্থায় যে সে মুহসিন সে তো দৃঢ়ভাবে ধরলো এক মযবুত হাতল। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহরই কাছে।

অর্থাৎ মুখে নিজেকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করার ঘোষণা দেয়া হবে কিন্তু কার্যত আল্লাহর অনুগত বান্দার নীতি অবলম্বন করা হবে না, এমনটি যেন না হয়। আর তা হবে কেবলমাত্র রাসূলকে অনুসরণ করার মাধ্যমে। এ আয়াতের প্রথম অংশ তাওহীদ আর দ্বিতীয় অংশ রাসূলের অনুসরন করা বাধ্য করে দিয়েছে। তাওহীদ পরিশুদ্ধ হতে হলে রাসূলের অনুসরণ জরুরী। [সা'দী]

وَ مَنۡ كَفَرَ فَلَا يَحۡزُنۡكَ كُفۡرُهٗ ؕ اِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ فَنُنَبِّئُهُمۡ بِمَا عَمِلُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ

২৩. আর কেউ কুফরী করলে তার কুফরী যেন আপনাকে কষ্ট না দেয় আমাদেরই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমরা তাদেরকে তারা যা করত সে সম্পর্কে অবহিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অর্থ হচ্ছে, হে নবী! যে ব্যক্তি আপনার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, সে তো নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে একথা মনে করে যে, ইসলামকে প্রত্যাখ্যান এবং কুফরীকে মেনে নিয়েও তার ওপর জোর দিয়ে সে আপনাকে অপমানিত করেছে। কিন্তু আসলে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। সে আপনার কোন ক্ষতি করেনি। বরং নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। কাজেই সে যদি আপনার কথা না মানে তাহলে তার পরোয়া করার প্রয়োজন নেই। [সাদী]

نُمَتِّعُهُمۡ قَلِیۡلًا ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ اِلٰی عَذَابٍ غَلِیۡظٍ

২৪. আমরা তাদেরকে ভোগ করতে দেব স্বল্প। তারপর আমরা তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব।

স্বল্প পরিমানও হতে পারে। আবার স্বল্প সময়ের জন্যও উদ্দেশ্য হতে পারে। দুনিয়ায় কাফেররা যা-ই পায় তা আখেরাতের তুলনায় পরিমানে স্বল্প আবার আখেরাতের তুলনায় স্বল্প সময়ের জন্যেই পেয়ে থাকে।

وَ لَئِنۡ سَاَلۡتَهُمۡ مَّنۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ لَیَقُوۡلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ ؕ بَلۡ اَكۡثَرُهُمۡ لَا یَعۡلَمُوۡنَ

২৫. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡغَنِیُّ الۡحَمِیۡدُ

২৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি তো অভাবমুক্ত, চির প্রশংসিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মুশরিকরা এটা স্বীকার করতো যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ। তা সত্ত্বেও তারা অন্যদের ইবাদত করতো। অথচ তারা ভালরূপেই জানতো যে, সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নয়। সবই তার অধীনস্থ। ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? এ প্রশ্ন তাদেরকে করলে তারা সাথে সাথেই উত্তর দিতো যে, এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই বটে। তাই আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও প্রশংসা যে আল্লাহরই তা তো তোমরা স্বীকারই করছো। প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, মুশরিকদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে ছোট, বড়, প্রকাশ্য, গোপনীয় যা কিছু আছে সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং সব তারই মালিকানাধীন। তিনি সবকিছু হতেই অভাবমুক্ত এবং সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী তিনিই। সৃষ্টিকার্যে ও আহকাম ধার্য করার ব্যাপারে তিনিই প্রশংসার যোগ্য।

وَ لَوۡ اَنَّ مَا فِی الۡاَرۡضِ مِنۡ شَجَرَۃٍ اَقۡلَامٌ وَّ الۡبَحۡرُ یَمُدُّهٗ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ سَبۡعَۃُ اَبۡحُرٍ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیۡزٌ حَكِیۡمٌ

২৭. আর যমীনের সব গাছ যদি কলম হয় এবং সাগর, তার পরে আরও সাত সাগর কালি হিসেবে যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা।

‘আল্লাহর কালেমা বা কথা’ এর মানে কি? এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে। যদিও এর প্রতিটিই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, আয়াতে বর্ণিত ‘আল্লাহর কালেমা বা কথা বলে মহান আল্লাহর জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলীই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর বাণীর কোন শেষ নেই। [সা’দী; মুয়াসসার] এ কুরআন তার বাণীরই অংশ। অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্রে সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্বেও এসবগুলির পানি দিয়ে আল্লাহর প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে- সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। যার প্রমাণ কুরআনের অন্য এক আয়াতে- যেখানে বলা হয়েছে -‘‘আল্লাহর মহিমাসুচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে

দেয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে-কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।” [সূরা আল-কাহফ: ১০৯]

মোটকথা: সমুদ্রসমুহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহর মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে-কিন্তু আল্লাহর বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত-কোন সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে আয়ত্ব করতে পারে? [দেখুন: ইবন কাসীর, কুরতুবী, সা'দী]

কোন কোন মুফাসসিরের মতে ‘আল্লাহর কালেমা বা কথা’ বলে এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর নেয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,- কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, তাই বুঝিয়েছেন। [কুরতুবী; মুয়াস্‌সার; ইবন কাসীর]

মূলত: আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর নেয়ামতসমূহ কোন কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করা চলে না, এখানে আল্লাহ এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান—গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন— যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহর মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর অর্থ, তাঁর সৃষ্টিকর্ম এবং তাঁর শক্তির নিদর্শন। [কুরতুবী] অর্থাৎ পৃথিবীর গাছগুলো কেটে যতগুলো কলম তৈরী করা যেতে পারে এবং পৃথিবীর বর্তমান সাগরের পানির সাথে আরো তেমনি সাতটি সাগরের পানিকে কালিতে পরিণত করলে তা দিয়ে আল্লাহর শক্তি ও সৃষ্টির কথা লিখে শেষ করা তো দূরের কথা হয়তো পৃথিবীতে যেসব জিনিস আছে সেগুলোর তালিকা তৈরী করাই সম্ভবপর হবে না। শুধুমাত্র এ পৃথিবীতেই যেসব জিনিসের অস্তিত্ব রয়েছে সেগুলোই গণনা করা কঠিন, তার ওপর আবার এই অথৈ মহাবিশ্বের সৃষ্টির বিবরণ লেখার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

مَا خَلْقُكُمْ وَ لَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

২৮. তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা।

সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা আমার কাছে একটি লোককে মেরে জীবিত করার মতই সহজ। কোন কিছু হওয়ার জন্য আমার শুধু হুকুম করাই যথেষ্ট । আল্লাহ তা‘আলা বলেন: “বস্তুতঃ তাঁর সৃষ্টিকার্য এরূপ যে, যখন তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে বলেনঃ “হও”, অমনি তা হয়ে যায়।” (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন: “আমার আদেশ তো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত।” (সূরা কামার ৫৪:৫০)

আল্লাহ তা‘আলা চাওয়া মাত্রই সকল কিছু হয়ে যাবে কিয়ামতও অনুরূপভাবে হবে।

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُوۡلِجُ الَّیۡلَ فِی النَّهَارِ وَ یُوۡلِجُ النَّهَارَ فِی الَّیۡلِ وَ سَخَّرَ الشَّمۡسَ وَ الۡقَمَرَ ۫ کُلٌّ یَّجۡرِیۡۤ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی وَّ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِیۡرٌ

২৯. আপনি কি দেখেন না, নিশ্চয় আল্লাহ রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান? আর তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন কাজে নিয়োজিত, প্রত্যেকটিই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত; এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশ নিয়ে দিনে ঢুকিয়ে দেন, যার ফলে দিন বড় ও রাত ছোট হয়; যেমন গ্রীষ্মকালে ঘটে থাকে এবং দিনের কিছু অংশ নিয়ে রাতে ঢুকিয়ে দেন, ফলে রাত বড় ও দিন ছোট হয় যেমন; শীতকালে ঘটে। 'নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত' উদ্দেশ্য কিয়ামত পর্যন্ত। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার যে প্রাত্যহিক নিয়ম আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপই বিদ্যমান থাকবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হল যে, ''এক নির্দিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত'' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা উভয়ের চলাফেরার জন্য এক নির্দিষ্ট স্থান ও কক্ষপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন যেখানে তাদের সফর শেষ হয় এবং দ্বিতীয় দিন পুনরায় সেখান থেকে আরম্ভ করে প্রথম স্থানে এসে যায়। একটি হাদীস দ্বারাও এই অর্থেরই সমর্থন হয়; একদা নবী (সাঃ) আবু যার্র (রাঃ)-কে বললেন, তুমি কি জানো এই সূর্য কোথায় অস্ত যায়? উত্তরে আবূ যার্র বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, আল্লাহর আরশ হল তার শেষ স্থান। সেখানে যায় এবং আরশের নিচে সিজদা করে এবং নিজ প্রতিপালকের কাছে পুনরায় সেখান থেকে উদিত হওয়ার অনুমতি চায়। এমন সময় আসবে যখন তাকে বলা হবে, 'তুমি যে দিক থেকে এসেছ ঐ দিকেই ফিরে যাও।' তখন সে পূর্ব দিক থেকে উদিত না হয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।'' যেমন কিয়ামতের নিকটবর্তী নিদর্শনাবলীর ব্যাপারে বলা হয়েছে। (বুখারীঃ তাওহীদ অধ্যায়, মুসলিমঃ ঈমান অধ্যায়) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'সূর্য চরকার মত, দিনের বেলায় আকাশে আপন কক্ষপথে চলে, অতঃপর যখন অস্তমিত হয়, তখন রাতের বেলায় পৃথিবীর নিচে (অপর প্রান্তে) আপন কক্ষপথে চলতে থাকে এবং পুনরায় পূর্ব থেকে উদিত হয়। চাঁদের ব্যাপারও অনুরূপ।' (ইবনে কাসীর)

ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡحَقُّ وَ اَنَّ مَا یَدۡعُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِهِ الۡبَاطِلُ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡکَبِیۡرُ

৩০. এগুলো প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তিনিই সত্য এবং তারা তাকে ছাড়া যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তিনি তো সর্বোচ্চ, সুমহান।

অর্থাৎ, এ সকল ব্যবস্থাপনা ও নিদর্শন আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যে, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পরিচালক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। যার আদেশ ও ইচ্ছায় এ সব কিছু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তিনি ছাড়া সব উপাস্যই বাতিল। অর্থাৎ তাদের কারোর নিকট কোন এখতিয়ার বা শক্তিই নেই; বরং সকলে তাঁর মুখাপেক্ষী। কারণ সবই তাঁর সৃষ্টি ও সবাই তাঁর অধীনস্থ। তাদের মধ্যে কেউ অণু পরিমাণও কিছু নড়াবার ক্ষমতা রাখে না।

اَلَمۡ تَرَ اَنَّ الۡفُلۡکَ تَجۡرِیۡ فِی الۡبَحۡرِ بِنِعۡمَتِ اللّٰهِ لِیُرِیَکُمۡ مِّنۡ اٰیٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّکُلِّ صَبَّارٍ شَکُوۡرٍ

৩১. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সাগরে বিচরণ যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু দেখাতে পারেন? নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

وَ اِذَا غَشِيَهُمۡ مَّوۡجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمۡ اِلَى الۡبَرِّ فَمِنۡهُمۡ مُّقۡتَصِدٌ ؕ وَ مَا يَجۡحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوۡرٍ

৩২. আর যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ছায়ার মত, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌছান। তখন তাদের কেউ কেউ মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে; আর শুধু বিশ্বাসঘাতক, কাফির ব্যক্তিই আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরো কিছু ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: সাগরে যে নৌযানসমূহ ভাসমান ও চলাচল করে তাও কেবল আমারই নির্দেশে হয়ে থাকে। লোহা পানিতে রাখলে ভেসে থাকে না, কিন্তু যখন তা নৌকা আকারে বানিয়ে পানিতে ছেড়ে দাও তখন কার নির্দেশে ভেসে থাকে? আল্লাহ তা'আলা বলেন: "যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের (কল্যাণে) নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:"তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা মৎস্য আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; (সূরা নাহল ১৬:১৪)

অতএব আল্লাহ তা'আলা যদি নৌযানগুলোকে সমুদ্রে চলার আদেশ না করতেন তাহলে এগুলো সমুদ্রে চলাচল করতে পারত না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের একটি মন্দ অভ্যাসের কথা উল্লে¬খ করেছেন, যে সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। তা হল যখন মানুষ বিপদে পড়ে তখন বিশুদ্ধচিত্তে, একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ তা'আলাকেই ডাকে। কিন্তু যখনই তাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দেয়া হয় তখনই তারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায় এবং তাঁর সাথে শরীক করে বসে।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:"সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন কেবল তিনি ব্যতীত অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৬৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "তারা যখন নৌযানে আরোহন করে তখন তারা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে রক্ষা করেন, তখন তারা শিরকে লিপ্ত হয়" (সূরা আনকাবুত ২৯:৬৫) তখনকার মক্কার মুশরিকরা বিপদে পড়লে সকল মা'বূদ বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ডাকত, কিন্তু বর্তমানে একশ্রেণির নামধারী মুসলিম বিপদে পড়লে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মাযার, বাবা, ওলী ও গাওস-কুতুবের কাছে দৌড়ায়। তৎকালীন মুশরিকদের চেয়েও এদের বিশ্বাস জঘন্য।

مقتصد দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, যারা এ প্রকার বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং তিনি তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের উচিত ছিল পরিপূর্ণভাবে তাঁর আনুগত্য করা ও সৎ আমলে আত্মনিয়োগ করা। কিন্তু এটা না করে তাদের কেউ কেউ মধ্যমপন্থী থাকে এবং কেউ কেউ পূর্ণ ভাবেই কুফরীর দিকে ফিরে যায়।

ختار বলা হয় গাদ্দার বা বিশ্বাস ঘাতককে। ختر এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণ বিশ্বাসঘাতক।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمۡ وَ اخۡشَوۡا يَوۡمًا لَّا يَجۡزِیۡ وَالِدٌ عَنۡ وَّلَدِهٖ ۫ وَ لَا مَوۡلُوۡدٌ هُوَ جَازٍ عَنۡ وَّالِدِهٖ شَيۡـًٔا ؕ اِنَّ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا ٝ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمۡ بِاللّٰهِ الۡغَرُوۡرُ

৩৩. হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন কর এবং ভয় কর সে দিনকে, যখন কোন পিতা তার সন্তানের পক্ষ থেকে কিছু আদায় করবে না, অনুরূপ কোন সন্তান সেও তার পিতার পক্ষ থেকে আদায়কারী হবে না। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সে প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে।

অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুত্রও পিতার কোন কল্যাণ করতে পারবে না। বন্ধু, নেতা, পীর এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য লোকেরা তবুতো দূর সম্পর্কের। দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকট সম্পর্ক হচ্ছে সন্তান ও পিতামাতার মধ্যে। কিন্তু সেখানে অবস্থা হবে যদি পুত্র পাকড়াও হয়, তাহলে পিতা এগিয়ে গিয়ে একথা বলবে না যে, তার গোনাহের জন্য আমাকে পাকড়াও করো। অন্যদিকে পিতার দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেলে পুত্রের একথা বলার হিম্মত হবে না যে, তার বদলে আমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দাও। এ অবস্থায় নিকট সম্পর্কহীন ভিন্ন ব্যক্তিরা সেখানে পরস্পরের কোন কাজে লাগবে এ আশা করার কি অবকাশই বা থাকে! [দেখুন, কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর] তবে এটা সত্য যে, যদি পিতা-পুত্র উভয়েই ঈমানদার হয় তবে মহান আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের পর-মর্যাদা উন্নীত করে তাদের একজনকে অপরের কাছাকাছি রাখবেন। যেমন, কুরআন কারীমে রয়েছেঃ (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ) "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে—আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে; আমরা এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব।" [সূরা আত-তূর: ২১]

যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌছার উপযোগী নয়। সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কেয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে, যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে। অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে, "তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও" [সূরা আর-রাদ: ২৩] তাদের সাথে প্রবেশ করবে যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমানিত হয় যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্তুতি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি বলতে কিয়ামতের প্রতিশ্রুতির কথা বুঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]
আয়াতে আল-গারূর বা 'প্রতারক' বলতে শয়তান কে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর, সা'দী]

اِنَّ اللّٰهَ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّلُ الۡغَيۡثَ ۚ وَ يَعۡلَمُ مَا فِی الۡاَرۡحَامِ ؕ وَ مَا تَدۡرِیۡ نَفۡسٌ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدًا ؕ وَ مَا تَدۡرِیۡ نَفۡسٌۢ بِاَیِّ اَرۡضٍ تَمُوۡتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর কাছেই রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা মাতৃগর্ভে আছে। আর কেউ জানে না। আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

এ আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লুকমান শেষ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কেয়ামত

সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে (অর্থাৎ, কোন বছর কোন তারিখে সংঘটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ, কন্যা না পুত্র, কতদিন বাঁচবে, কি রিযিক পাবে, কোন স্বভাবের অধিকারী হবে ইত্যাদি) এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন স্থানে মারা যাবে, তাও কেউ জানে না। প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহর অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। [দেখুন, তাবারী, কুরতুবী] এ পাঁচ বস্তুকে সূরা আল-আন' আমের ৫৯ নং আয়াতে (অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে)। তাছাড়া কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে সে ব্যাপারে হাদীসে জিবরীল নামে খ্যাত হাদীসেও অনুরূপ বলা হয়েছে যে, এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নেই। [দেখুন: বুখারী: ৪৭৭৭, মুসলিম: ৯, ১০]

ফুটনোট

চতুর্থ পর্ব: চূড়ান্ত জ্ঞান এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

সূরার শেষাংশে আল্লাহ সেই পাঁচটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন, যার জ্ঞান একমাত্র তাঁরই কাছে রয়েছে। এগুলো হলো গায়েবের চাবিকাঠি:

কিয়ামতের জ্ঞান: নিশ্চয়ই কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই কাছে।

বৃষ্টি বর্ষণের জ্ঞান: তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

মাতৃগর্ভের জ্ঞান: তিনিই জানেন, মাতৃগর্ভে কী আছে।

আগামীকালের জ্ঞান: কোনো ব্যক্তিই জানে না, সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে।

মৃত্যুর স্থান ও সময়ের জ্ঞান: এবং কোনো ব্যক্তিই জানে না, কোন স্থানে তার মৃত্যু হবে।

সূরাটি শেষ হয় এই শক্তিশালী ঘোষণার মাধ্যমে যে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন এবং তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে।

শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আকাশমণ্ডলী ও জমিনের সকল জিনিস আল্লাহ তা 'আলা মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি এবং নিয়োজিত করেছেন।

২. না জেনে কোন বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়।

৩. দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারো কথা গ্রহণ করা যাবে না।

৪. একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা 'আলার ইবাদত করতে হবে। ইবাদতের মধ্যে কোন প্রকার একনিষ্ঠতার ঘাটতি থাকলে চলবে না।

৫. দুনিয়া একদিন শেষ হয়ে যাবে। আর তখন মানুষকে আল্লাহ তা 'আলার নিকটেই ফিরে যেতে হবে।

৬. আল্লাহ তা 'আলা অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী যা মানুষের পক্ষে গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়।

৭. কোন কিছুর জীবন ও মরণ আল্লাহ তা 'আলার নিকট কোন কঠিন ব্যাপার নয়।

৮. আল্লাহ তা 'আলার অপার নেয়ামত যে, তিনি সাগরে নৌযান ভাসমান রেখে চলাচল করার উপযোগী করে দিয়েছেন।

৯. একশ্রেণির মানুষ বিপদে পড়লে আল্লাহ তা ‘আলাকে আহ্বান না করে বিভিন্ন মাযার, ওলী-আওলিয়া ও দরগাহ শরীফে বিপদ মুক্তির জন্য গমন করে যা প্রকাশ্য শির্ক।

১০. সকল বিপদাপদ ও মুশকিলের আসান দাতা একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলা, তাই তাঁকেই আহ্বান করা উচিত।

১১. আল্লাহ তা ‘আলাকে ভয় করতে হবে।

১২. পার্থিব মোহে পড়ে পরকালকে ভোলা যাবে না।

১৩. কিয়ামতের দিন কেউ কারো কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না।

১৪. অদৃশ্যের চাবিকাঠি পাঁচটি।

১৫. অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলা রাখেন, অন্য কেউ নয়।